ষষ্ঠ অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবী ও অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা

ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যখন সম-মানসিকতা সম্পন্ন সম-জাতিয় চরিত্র সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায়, তখন দুই বা ততোধিক স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। বাংলা সাহিত্যে তুলনামূলক আলোচনা প্রথম প্রচলন করেন 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'। তিনি সাহিত্যের সৌন্দর্য খুঁজেছিলেন সমগ্রতার মধ্যে। 'উত্তরচরিত' রচনা থেকেই তিনি পাশ্চাত্য পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। সেই সূত্রেই স্বদেশীয় 'জয়দেব'-এর সঙ্গে 'বিদ্যাপতির', 'কালিদাসের' 'কুমারসম্ভবে'র সঙ্গে 'মিল্টনের' 'প্যারাডাইস লস্ট', 'কালিদাসে'র নায়িকা শকুন্তলার সঙ্গে 'শেকসপীয়রের' দুই নায়িকা মিরন্দা ও দেসদিমোনার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে তুলনামূলক সাহিত্য বিচারের কথাই বলেছেন। অবশ্য এই সবের বহুপূর্বে ইংরেজ কবি 'মেথিউ আর্ণল্ড' ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম 'Comparative Literature' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এর পরবর্তীকালে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'Hutcheson Macaulay Posnett' প্রথম 'Comparative Literature' শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। 'Webster's' 'Encyclopaedic Unabridged Dictionary of English Lenguage' গ্রন্থে তুলনামূলক সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন –"The study of the literature of two or national groups differing on cultural background and usually in language, concentrating on their relationship to and influences upon each other."[১]

এই একই বিষয়ে একটু ভিন্নভাবে ‘ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন’ তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কে লিখেছেন। ‘সিনি সাহিত্য অকাডেমী’ দ্বারা প্রকাশিত ‘Contemporary Indian literature’ গ্রন্থে লিখেছেন –“There is a unity of outlook as the writers in different lenguages derive their inspiration from a common source and face more or less the same kind of experience, emotional and intellectual.”[২]

সার্বিক প্রেক্ষিতে আমরা তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনা সম্বন্ধে বলতে পারি যে, বিভিন্ন ভাষায় বা একই ভাষায় সমজাতীয় সৃষ্টি বা সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে স্বতন্ত্র ও স্পষ্ট করে তোলা। সেক্ষেত্রে একালের সাহিত্যের সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের তুলনা হতে পারে। এই বিচার বিভিন্ন ভাষায় সম-মানসিকতা সম্পন্ন কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও কথাকার সাহিত্যিকদের মধ্যে হতে পারে। কোনো একজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে কিছু বিষয় বিশ্লেষণ করতে হলে, তাঁর সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের রচনাতেও সমান দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তাতে করে এই দুই পর্বের ঔপন্যাসিকদের রচনার সঙ্গে আলোচ্য ঔপন্যাসিকের রচনার তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব। ঔপন্যাসিকরা তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে মানুষের সমাজ ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপরেখা তুলে ধরেন। আর তা সঠিক মূল্যায়ন হয় তুলনামূলক পদ্ধতির দ্বারা। সুতরাং সাহিত্য সমালোচনার অন্যতম ধারা হিসেবে তুলনামূলক অধ্যয়ন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত সূত্র ধরেই ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ পূর্ববর্তী ও সমকালীন লেখক-লেখিকাদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা যেতে পারে। আমরা দাম্পত্য সম্পর্ক কেন্দ্রিক তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে দুটিপর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি। আলোচ্য পর্বদুটি হল যথাক্রমে:–

১/ ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ও অন্যান্য নারী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা।

২/ ‘আশাপূর্ণা দেবী’ ও অন্যান্য পুরুষ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা।

➢ **'আশাপূর্ণা দেবী' ও অন্যান্য নারী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা :-**'আশাপূর্ণা দেবী' ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বলেছিলেন যে –'পূর্বজ লেখক-লেখিকাদের ঋণ তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে'। আমরা সহজেই একটি কথা স্বীকার করে নিতে পারি যে, সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের নানারকম স্তর অতিক্রম করার পরে, একজন নারী ঔপন্যাসিক হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন। উপন্যাসের মতো জটিল সাহিত্য রচনার জগতে নারীরা তুলনায় পুরুষদের থেকে অনেক পরে প্রবেশ করেন। অবশ্য নানারকম সামাজিক অবরোধ জনিত কুসংস্কার এই বিলম্বের মূল কারণ বলে অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। 'স্বর্ণকুমারী দেবী', 'নিরুপমা দেবী', 'অনুরাধা দেবী', 'গীরিবালা দেবী', 'সীতা দেবী', 'শান্তা দেবী', 'অনুরূপা দেবী', 'জ্যোতির্ময়ী দেবী' ও 'আশাপূর্ণা দেবী'দের মতো ঔপন্যাসিকদের যেভাবে সমাজের নানারকম বাঁধা অতিক্রম করে লেখার জগতে প্রবেশ করতে হয়েছে, তা পৃথিবীর যে কোন সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পূর্বজদের তুলনায় পরবর্তীকালের অন্যতম নারী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে 'মহাশ্বেতা দেবী', 'বাণী বসু', 'নবনীতা দেবসেন', 'মদ্রাকান্তা সেন', 'তিলোত্তমা মজুমদার', 'তসলিমা নাসরীন', 'সুচিত্রা ভট্টাচার্য', 'সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়', 'সেলিনা হোসান', 'মল্লিকা সেনগুপ্ত' প্রমুখদের চলার পথ কিছুটা হলেও প্রশস্ত ও মসৃণ হয়েছে পূর্বজদের কর্মসফলতার কারণে। প্রখ্যাত উপন্যাস সমালোচক 'শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়' আলোচ্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করে লিখেছেন:–

''বাংলা উপন্যাসে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা মহিলা ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব। উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় প্রেম, নর-নারীর পরস্পরের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ রহস্য; ইহারই অফুরন্ত বিচিত্রতা উপন্যাসের পৃষ্ঠায় পল্লবিত হইয়াছে। এই প্রেম চিত্রণের ভার যদি সম্পূর্ণরূপে পুরুষেরই একচেটিয়া হয়, তাহা হইলে ইহা যে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ একদেশদর্শী হইবে ইহা

অনুমান করা কঠিন নয়। ...অবশ্য ইহাও সত্য যে, সাহিত্যের উৎকর্ষের মানদণ্ড স্ত্রী-পুরুষ নিরপেক্ষ ভাবে নির্ধারিত হইয়াছে– পুরুষ-নারীর রচিত সাহিত্য-বিচারে কোন ভিন্ন আদর্শ নাই। চরিত্র বিশ্লেষণে ও জীবন সমস্যার গভীরতা প্রতিপাদন সমস্ত উৎকৃষ্ট উপন্যাসেরই সাধারণ ধর্ম''।(৩)

নারী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তাই ভিন্নতা তেমনভাবে চোখে পড়ে না, সকল নারী ঔপন্যাসিক প্রায় একইভাবে সমাজের বিভিন্ন ঘটনার রূপাঙ্কনে সহজাত রূপে নিয়োজিত ছিলেন। তবুও আলোচনার প্রেক্ষিত হিসেবে বলা যায়, 'আশাপূর্ণা দেবীর' তুলনায় অন্যান্য নারী ঔপন্যাসিকদের রচনায় কিছুটা স্বাতন্ত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি যেভাবে পরিবার তথা সমাজের অন্তঃপুরকে দেখেছেন ও বুঝেছেন, তারই প্রতিরূপ প্রতিচ্ছবি যেভাবে লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন; তুলনায় অন্যান্য নারী ঔপন্যাসিকরা কিছুটা হলেও সেই স্থানে সঠিকভাবে পারদর্শীতা দেখাতে পারেননি বলে মনে করা যেতে পারে।

প্রথম দিকে যে নারী-ঔপন্যাসিকরা কলম ধরেছেন তাঁরা অনেকেই পুরুষ-ঔপন্যাসিকদের কন্ঠস্বরকে প্রাধান্য দিয়ে সাহিত্য রচনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়। কারণ উপন্যাস রচনার যে ধারা পুরুষ-ঔপন্যাসিকরা তৈরি করেছিলেন সেই পথকে খুব সহজে অগ্রাহ্য করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রথম দিকের নারী-ঔপন্যাসিকদের পড়াশুনা শিক্ষার দিকটিও আলোচ্য বিষয়ে বিশেষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে 'শিবনাথ শাস্ত্রী' 'বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার আয়োজন' সম্পর্কে লিখেছেন–

''...১৮৪৯ সালে মহাত্মা বীটন্ বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন বলিয়া এরূপ কেহ মনে করিবেন না যে, বঙ্গদেশে তাহাই স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রচলন। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিবার

চেষ্টা চলিতেছিল। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দিতেছি : ১৮১৭ সালে স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হওয়া অবধি এই প্রশ্ন উঠে যে, বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হইবে কিনা? এই বিষয় লইয়া সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। রাধাকান্ত দেব উক্ত সোসাইটির অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার সপেক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন; এবং স্কুল সোসাইটীর অধীনস্থ কোনও কোনও পাঠশালাতে বালকদিগের সহিত বালিকাদিগকেও শিক্ষা দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করেন''[৪]।

একইসঙ্গে সমালোচক 'শাস্ত্রী মহাশয়' স্বীকার করেন যে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা হলেও তা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়নি। তাই নারীদের শিক্ষার গতি শম্বুকগতিতে এগিয়ে চলেছিল, আর তার পেছনে ছিল পুরুষ সমাজপতিদের দয়া-দাক্ষিন্য। তাই আমরা স্বাভাবিক ভাবে স্বীকার করে নিতে পারি যে, নারীদের শিক্ষার জগতে বিলম্বে প্রবেশের কারণে সাহিত্য রচনার প্রাকমুহূর্তে পুরুষ-সাহিত্যিকদের প্রাধান্যতা ও দয়া-দাক্ষিন্য ছিল। যদিও আমরা সাহিত্যের যথাযথ মানদণ্ডের বিচারে বলতে পারি– ''পুরুষ অথবা নারী যাঁরই রচনা হোক সাহিত্যের মানদণ্ড হবে সাহিত্যের গুণ যথার্থ বজায় আছে কিনা তা খতিয়ে দেখে''[৫]। অবশ্য নারীদের রচিত সাহিত্যের যথার্থ বিশ্লেষণ করার জন্য উদ্ধৃত মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য, এছাড়াও যে কারণগুলি নারী ঔপন্যাসিকদের সাহিত্য রচনার প্রতিকুলতার জন্য যথাযথ বলে মনে হয় তা নিম্নে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:–

প্রথমত:– পুরুষদের তুলনায় নারীদের পড়াশোনা তথা শিক্ষার জগতে অনেকটা বিলম্বে প্রবেশ করা।

দ্বিতীয়ত:– নারীদের নানারকম সামাজিক কুসংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করতে হয়েছে, এবং কিছু ক্ষেত্রে পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হয়েছে।

তৃতীয়ত:– নারীদের মেনে নিতে হয়েছে পরিবারের নানারকম অনুশাসন ও গণ্ডিবদ্ধ জীবনের কুসংস্কার।

চতুর্থত:– নানাবিধ কারণ দেখিয়ে পুরুষশাসিত সমাজে নারী রচিত সাহিত্যের সামাজিক স্বীকৃতিতে বাঁধা।

পঞ্চমত:– নারীদের প্রতি পিতৃতন্ত্রের আক্রোশ।

উপন্যাস রচনার প্রথম দিকে নারী ঔপন্যাসিকদের কিছুটা প্রক্ষিপ্ত ও পদানুসরণ করতে হয়েছিল। আর তাই ব্যতিক্রমী সাহিত্য রচনায় আমরা প্রথম দিকের নারী ঔপন্যাসিকদের তেমনভাবে পাইনি। যদিও স্বীকার করে নিতে হয় 'স্বর্ণকুমারী দেবী' ও 'নিরুপমা দেবী' প্রমুখদের মতো লেখিকাদের স্বভাবসিদ্ধ সফলতার কথা। এই প্রসঙ্গে 'সুদক্ষিণা ঘোষ' লিখেছেন–

''বিংশ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় দশকের যে সমাজে দাঁড়িয়ে অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী বা গিরিবালা দেবীরা উপন্যাস লিখেছেন, সে সমাজ ছিল পুরুষ প্রাধান্যের, নারী জীবনও প্রধানত ছিল পুরুষ নির্ভর, পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েই গড়ে উঠতে শিখত অধিকাংশ মেয়েই, তাই স্বভাবতই এঁদের রচনাতেও এসেছে পুরুষ প্রাধান্য, কোনো পুরুষের আশ্রয়ের নিরাপত্তায় পৌঁছে তাঁরা মনে করেছেন সেইখানেই পথ চলার শেষ। তবু, নিরুপমা দেবী তার মধ্যেই খুঁজেছিলেন প্রতিবাদী কন্ঠস্বর, স্বামীকে বাদ দিয়ে জীবন যাপনের ছবি কখনো কখনো প্রতিবাদ হিসেবে ধরা দিয়েছে তাঁর উপন্যাসে''[৬]।

‘নিরুপমা দেবীর’ উপন্যাসে যেরকম দাম্পত্য জীবনের কথা আমরা জানতে পারি; ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ উপন্যাসেও অনুরূপ দাম্পত্য সম্পর্কের কথাচিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ‘অনুরূপা দেবী’ ও ‘গিরিবালা দেবী’দের মতো ঔপন্যাসিকরা সুখী দাম্পত্য জীবনের কথা সাহিত্যের মধ্যে বেশী করে বলতে পছন্দ করতেন। বিশেষত তাঁদের উপন্যাসে দেখা যায় স্বামীর পায়ে জীবন আত্মবিসর্জন দিয়ে নারীরা বধূবেশে সারাজীবন সুখেই কাটিয়ে দেয়। নিজেদের দাম্পত্য জীবনকে মধুর করে তোলাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। সেই পটভূমিকায় ‘অনুরূপা দেবী’ কিছুটা চেষ্টা করেছেন প্রতিবাদী সত্তার মধ্য দিয়ে দাম্পত্য সম্পর্ককে প্রকাশ করতে। স্বামীত্বের অটল সংস্কারকে মেনে না নিয়ে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্ররা প্রতিবাদ করে, অধিকারের প্রশ্নে, মর্যাদার প্রশ্নে, নারীত্বের প্রশ্নে। তাঁর ‘অন্নপূর্ণার মন্দির’ উপন্যাসটির কথা আলোচ্য প্রসঙ্গে সূত্রালেখ করা যেতে পারে। ‘সতী’ নামে নায়িকা চরিত্রটি যেভাবে প্রতিবাদ করেছে তা পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে তেমন চোখে পড়ে না। প্রণয় প্রার্থী ‘বিশ্বেশ্বর’ একদিন ‘সতীর’ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিল। এরপর অনেক জল গড়িয়ে গেছে সংসার নদী দিয়ে, ‘সতীর’ সঙ্গে ‘বিশ্বেশ্বরের’ মিলন সম্ভব হয়নি। বহুদিন পর নিজের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনে দিয়ে ‘সতী’ প্রতিবাদের ভাষায় ‘বিশ্বেশ্বর’কে চিঠি লিখে জানায় –“এই অধম জাতিকেই একদিন তুমি ভালোবাসিবে, এ অধম জাতি বুকের মধ্যে কতখানি সমুদ্র লুকাইয়া রাখে, একদিন তাহা মর্মে মর্মে বুঝিবে। সেদিন স্বীকার করিবে, সংসারে স্নেহের আদান-প্রদানই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সুখ”।[৭] আমরা ‘আশাপূর্ণা দেবী’ রচিত ‘বকুলকথা’ উপন্যাসের ‘বকুল’ চরিত্রটির কাছে এরকম প্রতিবাদী স্বর শুনতে পাই। যে প্রেম প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর কোনদিন বিবাহ করবে না সংকল্প করে জীবন কাটিয়ে দেয়। আসলে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ যেখান থেকে পথ চলা শুরু করেছিলেন, তাঁর

পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকরা সেখানে এসেই চলার পথ শেষ করেছিলেন। ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’ আর ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ সময়ের ব্যবধানের কারণে তাঁদের রচিত সাহিত্যের বিষয় স্বাভাবিক ভাবে ভিন্নতর হয়েছে। ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’ রচিত ‘কাহাকে’ উপন্যাসে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে মূলত সুখী-দাম্পত্য জীবনের কথাই বলতে চেয়েছেন বলে মনে করা হয়, দাম্পত্য জীবনে নারীর ভালোবাসা ও অধিকার নিয়েই তিনি মূলত প্রশ্ন করেছেন। যেভাবে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ সৃষ্ট অনবদ্য চরিত্র ‘সত্যবতী’ স্বামীর অভিশাপের বিরুদ্ধে বলে–“তাই তো দিয়ে আসছো তোমরা আবহমানকাল থেকে। স্বামী হয়ে, বাপ হয়ে, ভাই হয়ে, ছেলে হয়ে। ওটা নতুন নয়, অভিশাপেরই জীবন আমাদের”[৮]।

‘আশাপূর্ণা দেবী’র উপন্যাস অনুসন্ধান করে যেরকম দাম্পত্য সম্পর্কের কথা পাওয়া যায়, তার কিছুটা মিল পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের পাতায় লক্ষ করা যেতে পারে। তবে একই সঙ্গে একথাও বলা যেতে পারে যে পূর্ববর্তী নারী-ঔপন্যাসিকদের সাহিত্যের মধ্যে ছিল নিয়মানুবর্তীতা ও অনুকরণ বিষয়ক দাম্পত্য জীবনের প্রকাশ, যা ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ উপন্যাসে নেই বললেই চলে। পূর্ববর্তী নারী ঔপন্যাসিকরা সুখী-দাম্পত্যের মধুর মিলন দেখিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি সাধিত করেছেন। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ সুখী-দাম্পত্য অথবা অসুখী-দাম্পত্য উভয় ক্ষেত্রে সাবলীল; এবং তিনি শুধু বিবরণ নয়, সমস্যা নির্ণয় করে সমাধানের পথ তৈরির সূত্র নির্দেশ করেছেন।

‘আশাপূর্ণা দেবী’র উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি শুধুমাত্র পারিবারিক-দ্বন্দ্বের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে অনুসন্ধান করে, তাঁর পূর্ববর্তী নারী-ঔপন্যাসিকদের রচনায় নারীচরিত্রগুলির দাম্পত্য সম্পর্ক সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ পেয়েছে। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ তাঁর

প্রথম উপন্যাসে যেভাবে সুখের আড়ালে নষ্ট-দাম্পত্যের কথা বলেছেন, তা প্রমাণ করে যে তিনি সেকাল ও পরবর্তীকালের নারীদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন। তিনি লেখার মধ্য দিয়ে আঘাত দিতে চেয়েছেন সেই সমস্ত সমাজপতিদের, যারা 'বাল্যবিবাহ', 'বহুবিবাহ', 'গৌরীদান', 'কন্যাদান' এরকম বহুনামে নারীদের কুসংস্কারের অন্ধকারে বন্দী করে রাখতে চেয়েছেন। তাই হয়ত তিনি প্রথম উপন্যাসের নায়িকা 'আরতির' মধ্য দিয়ে অন্ধকার বন্ধন ত্যাগ করে আলোর পথের সন্ধান দিয়েছেন। নিজের জীবনের সমস্ত দুর্গতি মেনে নিয়েও 'আরতির' দাম্পত্য জীবনের সুখ স্থায়ী হয়নি। তার দাম্পত্য জীবনের সুখ হঠাৎ উধাও হয়ে যায় গৃহী থেকে সন্ন্যাসী হওয়া স্বামীর অবহেলার কারণে। তবু সে দাঁত কামড়ে পরে থাকে সংসারের কঠিন বন্ধনে। কিন্তু যখন তার একমাত্র সন্তান অবহেলায় বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, তখন সে স্বার্থপর স্বামীকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পরবর্তী জীবনে 'আরতি' আবার আর একজন সহৃদয় মানুষের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল। অবহেলায় আত্মবিসর্জন না দিয়ে প্রতিবাদের যে ভাষা 'আরতি' খুঁজে পেয়েছে তা পাঠককে কিছুটা স্তম্ভিত করে দেয়। আলোচ্য বিষয়ের নিরিখে স্বাভাবিক ভাবে বলা যেতে পারে, প্রথম দিকের নারী ঔপন্যাসিকদের তুলনায় 'আশাপূর্ণা দেবীর' উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ ও বিবরণে একটু ভিন্ন মাত্রা লক্ষ করা যায়। পূর্ববর্তিনী ঔপন্যাসিকদের প্রভাব তাঁর লেখায় আছে কিনা, সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন–

"পূর্ববর্তিনীদের প্রভাব পড়েছে কিনা, সে বিচার পাঠকের। তবে আমার যা কিছু জানা সবই তো বই পড়ে। যাঁদের বই পড়েছি সেখান থেকে কিছু নিয়েছিও হয়তো। তবে স্বেচ্ছায় কাউকে অনুকরণ করেছি বলে মনে হয় না। তবে আগে যাঁরা লিখতেন তাঁরা মোটামুটি সবাই আদর্শ প্রধান লেখা লিখতেন, অর্থাৎ সেখানে বলা হত 'এরকম হওয়া উচিত'। আমি

বরাবরই লিখি ‘এরকম হয়’। এইরকম হওয়া উচিত একথা বলি না। ...আমি মেয়েদের জীবনের মানসিক সংগ্রামের কথাই বলেছি। বহির্জীবনের জটিলতার জট খুলতে চেষ্টা করিনি। অর্থাৎ আমার লেখা প্রধানত মনস্তত্ত্বমূলকই। ঘটনাবহুল তেমন নয়’’।[৯]

পূর্ববর্তিনী ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে লেখিকা নিজে যে পার্থক্যের কথা বলেছেন, তারপরে আর তেমনভাবে আলোচ্য প্রসঙ্গে বিশেষ কিছু বলার থাকে না। অন্যদিকে ঔপন্যাসিক নিজেই তাঁর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। তিনি জেনে-বুঝেই লিখেছেন সমাজে যে ঘটনাগুলি ঘটে তার বিবরণ, তিনি কখনোই লেখেননি যে সমাজে এরকটাই হওয়া উচিৎ। তাই তাঁর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আমরা খুব সহজেই পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের রচিত উপন্যাসের থেকে তাঁর রচিত উপন্যাসের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি।

- **‘আশাপূর্ণা দেবী’ ও অন্যান্য পুরুষ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা:-** বাংলা কথাসাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকেই নারী ঔপন্যাসিকদের তুলনায় পুরুষ ঔপন্যাসিকরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সাহিত্যের ইতিহাসে সেকথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ‘প্যারিচাঁদ মিত্র’, ‘ভূদেব মুখোপাধ্যায়’, ‘কালিপ্রসন্ন সিংহ’ প্রমুখ ঔপন্যাসিকরা যে পথে চলার সূচনা করেছিলেন ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ তাতে বিশেষ পালক সংযোজন করেছিলেন। উপন্যাস রচনা ও উৎকৃষ্টতার বিচারে তাঁর নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করা হয়। নানাবিধ কারণে সমালোচক ‘অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়’ তাঁকে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলে অভিহিত করেছেন।[১০] অবশ্য সেজন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কারণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে উঠে আসতে পারে। আমরা জানি কথাসাহিত্যের দুটি শাখার রচনাগুণেই সৃষ্টি ও বিকাশের

ধারাবাহিক ইতিহাস ধারণ করে জন্মলগ্ন থেকে লালিত-পালিত হয়েছে। সাধারণত যেকোন একজন কথাকার সেই ঘটনাবলীকেই সাহিত্যে সৃজন করেন, যা বাইরের জগত থেকে তাঁর মনের মধ্যে জারিত হয়। আবার বাইরের জগতের মতো করেই তিনি তা সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকেন। মূলত ঔপন্যাসিকদের উপর এই দায়িত্ব বেশী করে বর্তায় বলে মনে করা যায়। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবে একটি কথা বলা যায় যে, সমাজের সমসাময়িক ঘটনার অভিঘাত যেভাবে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে প্রকাশিত হয়, সাহিত্যের অন্য কোন শাখায় সেইভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না। যদিও বৈধ-অবৈধ প্রেম, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের নানা রূপ থেকে রূপান্তর মধ্যযুগের সাহিত্য পাঠ করেও আমরা জানতে পারি। কিন্তু বর্তমান অর্থনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে বদলে যাওয়া মানুষের সম্পর্কের ব্যাখ্যান আধুনিককালের অন্যতম সাহিত্যশাখা উপন্যাসের মধ্যে আরও নিবিড় ও সূক্ষ্মভাবে চোখে পড়ে। মূলত যুগসমস্যা-যুগযন্ত্রণা যেভাবে ঔপন্যাসিকদের ভাবিয়ে তুলেছে এবং যেরকম ভাবে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন একালের মানুষের জীবনযাত্রা, তাই যেন তাঁদের রচিত উপন্যাসের শরীরে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরে থাকেন। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমালোচক ‘সত্যেন্দ্রনাথ রায়’ একটি মন্তব্য করেছেন, তিনি লিখেছেন –

“উপন্যাস তার জন্মকালীন পরিবেশ দ্বারা, তার ঐতিহাসিক দায়িত্বের দ্বারা, যে আবেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে তার জন্ম সেই আবেগ ও উৎকণ্ঠার দ্বারা অনেকখানিই যে নিয়ন্ত্রিত হয় তাতে সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই যে তার কন্টেন্ট ও ফর্ম, তার বিষয় এবং রূপ, দুইই কিছু পরিমানে এই নিয়ন্ত্রণের অধীন। আবার এতেও কিন্তু সন্দেহ নেই যে, উপন্যাসকারের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি, তাঁর নিজস্ব জীবনবোধ, তাঁর নিজস্ব শিল্পবোধ, রূপসৃষ্টি, রীতি-সচেতনতা, উপন্যাসকারের ব্যক্তিগত প্রতিভা, এ-ও উপন্যাসকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে। উপন্যাসের কন্টেন্ট ও ফর্ম দুইই প্রতিভার এই

নিয়ন্ত্রণকে মেনে নেয়। উপন্যাস একই সঙ্গে শিল্পীর সামাজিক ক্রিয়া এবং তাঁর ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশ। ভাষান্তরে বলা যায় উপন্যাস একইসঙ্গে শ্রেণীর প্রকাশ ও ব্যক্তিরও প্রকাশ"[১১]।

এই ব্যক্তি ও শ্রেণীকে নিয়েই সমাজের যে দ্বন্দ্ব তার যোগসূত্রের কারণে গড়ে ওঠে বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন। যেভাবে পর্যায়ক্রমে উপন্যাসের ধারা এগিয়ে গেছে ঠিক সেভাবেই পাল্টে গেছে কাহিনী ও চরিত্রের বয়ান। আর তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের রচনার তুলনা ঠিক যথাযথ ভাবে প্রস্ফুটিত হয় না। যদিও 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের' আগে যাঁরা উপন্যাস রচনা করার প্রয়াস দেখিয়েছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের রচনার শিল্প সার্থকতা পরবর্তীকালের সমালোচকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। প্রথম উপন্যাসের নিদর্শন হিসেবে 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসটিকে ধরা হয়, কিন্তু সে সম্পর্কে সমালোচকদের সুরে সুর মিলিয়ে বলা যায় –"উপন্যাসটিতে অনেক বেশী সত্য আছে, কিন্তু তুলনায় জীবন জিজ্ঞাসার অভাব লক্ষ্যণীয়"[১২]। তাই 'বঙ্কিম পর্ব' থেকেই আলোচনার সুবিধার জন্য এই বিষয়ের তথ্য সন্ধানের চেষ্টা করা যেতে পারে। 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' মূলত বেশীরভাগ উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিভিন্ন আঙ্গিক রচনা করেছেন বলে মনে করা হয়। 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'কপালকুণ্ডলা', 'রজনী' ইত্যাদি উপন্যাসে বিবাহিত পুরুষের বিভিন্ন আসক্তি ও ফলাফল হিসেবে নষ্ট-দাম্পত্য সম্পর্কের কথা লক্ষণীয়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই তিনি অবৈধ-দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটিয়েছেন কেন্দ্রীয়-চরিত্রের মৃত্যু দৃশ্যের মধ্য দিয়ে। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' ও তাঁর পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে মৃত্যুকে নয় জীবনকেই প্রাধান্য দেওয়ার রীতি প্রচলিত হতে শুরু করে। একবাক্যে স্বীকার করতে হয় এক্ষেত্রে কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেছেন 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। 'ফ্যাক্ট অফ এন্ডিং' দেখিয়ে 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'

যেখানে জনপ্রিয় ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ ও পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকরা ‘ফ্যাক্ট অফ স্টারটিং’ দেখিয়ে উপন্যাসের বহুরূপতার পথ খুলে দেন। ‘আশাপূর্ণা দেবী’ অবশ্য ‘বঙ্কিমচন্দ্র’, ‘রবীন্দ্রনাথ’ ও শরৎচন্দ্র প্রমুখদের সাহিত্য রচনার অনুগামী হয়েও নারীকে ভিন্ন পথে জয়ী করে তুলেছেন তাঁর বেশীর ভাগ উপন্যাসে। তিনি অবশ্য মৃত্যুকে নয় জীবনকেই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু জীবনের কথা বলতে গিয়ে জীবন-মরণ সংগ্রামের কথা তেমন ভাবে তুলে ধরেননি। অবশ্য অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের তুলনায় তিনি উপন্যাসের পাতায় অবৈধ-সম্পর্কের কথা অনেকটা কম পরিমানে ব্যক্ত করেছেন। আজকের পাঠক হিসেবে আমরা বলতে পারি ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ আসলে দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র আঁকতে গিয়ে পাঠককে অলক্ষ্যে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন এবং পরবর্তীকালে ঘটনা পরম্পরায় সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানসিক সুস্থ সুকুমার বৃত্তির জয় ঘোষণা করেছেন। ‘বঙ্কিমচন্দ্রের’ কয়েকটি উপন্যাসে বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গ আছে। আট-নয় বছরের ‘শৈবালিনীর’ বিবাহ হয়েছিল শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ‘চন্দ্রশেখরের’ সঙ্গে। শুধু বাল্যবিবাহ নয় তিনি তার পরিণাম বা পরিণতিও দেখিয়েছেন ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে। আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ বাস্তবতাকে যথার্থ ভাবে চিত্রিত করেছেন সাহিত্যসম্রাট ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’। সেকালের নারীদের জীবন ও জীবন কেন্দ্রিভূত সমস্যাকে তুলে ধরতে গিয়েই তিনি সৃষ্টি করেছেন ‘সূর্যমুখী’, ‘কুন্দনন্দিনী’, ‘ভ্রমর’, ‘প্রফুল্ল’, ‘শৈবালিনী’, ‘বিমলা’, ‘আয়েষা’, ‘মৃণালিনী’, ‘কপালকুণ্ডলা’, ‘মতিবিবি’, ‘রজনী’, ‘লবঙ্গলতা’, ‘রোহিনী’, ‘হীরামালিনী’, ‘জেবউন্নিসা’, ‘দরিয়াবিবি’, ‘কল্যানী’ প্রমুখ নারী চরিত্রের। উক্ত নারী চরিত্রগুলির মধ্যে অনেকেই বেশীরভাগ সময়ে পুরুষের অঙ্গুলীহেলনে পুতুলের মতো জীবনযাপন করেছে। নারীর অন্তকরণকে তেমনভাবে ‘বঙ্কিমচন্দ্রের’ উপন্যাসে আবিষ্কার করা সম্ভব হয় না বলেই মনে হয়। শুধুমাত্র

সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ও তাকেই কেন্দ্র করে মোহিত পুরুষের লিপ্সার কারণে ফলাফল হিসেবে দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন ও বিপর্যয়ের চিত্রকথার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'বঙ্কিমচন্দ্রের' পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকরা নানারকম দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে পুরুষদের তুলনায় নারীকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন বলে মনে হয়। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' উপন্যাস রচনার সময়কাল থেকেই সেই প্রবণতা লক্ষণীয়। পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উক্ত প্রবণতা থেকে 'আশাপূর্ণা দেবী' ব্যতিক্রমী হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে উপন্যাসের কাহিনীতে নারী ও পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্ব সহকারে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এককেন্দ্রিকতা তেমনভাবে লক্ষ করা যায় না। তাঁর সমস্ত উপন্যাসগুলিতে তেমনভাবে কোথাও নারীকে পুতুলের মতো পুরুষের ইশারায় চালিত হতে দেখা যায়নি। তুলনায় যেন পুরুষ চরিত্রের থেকে নারী চরিত্রগুলিকে অনেকটাই প্রতিবাদী হিসেবে লক্ষ করা যায়।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' রচিত উপন্যাসে পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের তুলনায় মানুষের সমস্তরকম সম্পর্কের নতুন ভাষ্যের সন্ধান বেশী করে পাওয়া যায় বলে মনে করা হয়। একদিকে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের সম্মেলনে সমস্তরকম কর্মপন্থায় পুরুষের স্থান নারীকে দখল করতে দেখা যায়। অন্যদিকে বহুকালের প্রেক্ষিতে প্রাচীন সাহিত্য থেকে যে মানব দেহ কেন্দ্রিক বন্দনা শুরু হয়েছিল, তা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে তিনি প্রথম মনের মানুষ ও মননের স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়েছেন। 'চোখের বালি' 'ঘরে বাইরে' 'চতুরঙ্গ' 'চার অধ্যায়' প্রতিটি উপন্যাসে পালাবদলের কথা চোখে পড়ার মতো। 'আশাপূর্ণা দেবীর' ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছিল যে, তিনি একাধারে 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', 'তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়' 'বিভুতিভূষণ

চট্টোপাধ্যায়' সহ অনেকের রচিত সাহিত্য পাঠ করে নিজের ক্ষেত্রে নির্যাস রূপক চরিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর রচিত উপন্যাসে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' প্রভাব ও কিছু মিল স্বাভাবিক ভাবে চোখে পড়ার মতো।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' সাহিত্যের মতো 'আশাপূর্ণা দেবীর' বহুউপন্যাসে সময়ের দ্রুততা ও প্রক্ষেপ নেই। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' সৃষ্ট 'বিনোদিনী' চরিত্রের মননের মতোই 'আশাপূর্ণা দেবী' 'সত্যবতী' চরিত্রের মন ও মননকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' লেখা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে যেভাবে 'বিমলার' জীবন সংকট ঘনীভূত হয়েছে, 'আশাপূর্ণা দেবীর' লেখা 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে অনুরূপ সংকটের সন্ধান পাই 'সুবর্ণলতা' চরিত্রের মধ্য দিয়ে। আপাতমস্তক আদর্শবাদের মোড়কে জড়ানো 'রবীন্দ্রনাথ' সৃষ্ট 'নিখিলেশ' ভেবেছিল 'বিমলার' সমস্ত অন্তঃকরণটি মোড়া রয়েছে শুধু তাকে দিয়ে। তারই পরীক্ষা নিতে গিয়ে 'বিমলা'কে বিভ্রান্তির পথে ফেলে দিয়েছিল 'নিখিলেশ', যার পরিনামে 'বিমলার' পদস্খলন ঘটে। কিন্তু সেখানে পাঠক অপেক্ষা করে 'বিমলার' পূর্ব অবস্থান ফিরে পাওয়ার আসায়। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' এইস্থানে প্রশ্ন চিহ্ন রেখে দেন। তাঁর সাহিত্যে দেখা যায় সম্পর্কের বিশ্লেষণে ন্যায়বোধ, নীতিবোধ এবং সর্বপরি গভীর মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত অবস্থান। 'আশাপূর্ণা দেবী' হয়তো সচেতন ভাবে 'রবীন্দ্রনাথের' উপন্যাস রচনার উক্ত আদর্শগুলিকে তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। তিনি 'সুবর্ণলতা'কে ঘর-সংসারের মধ্যে রেখে দেখিয়েছেন সংসারের অন্য কোন সদস্য তাকে ঠিক করে বুঝতেই পারেনি, এমনকি স্বামী 'প্রবোধ'ও তার ধারেকাছে নেই। সন্তান, স্বামী ও অন্যান্য সকলের কাছে পর্যুদস্ত 'সুবর্ণলতা'ও তাই শেষপর্যন্ত তার মা 'সত্যবতীর' আদর্শকে মেনে নিয়ে সামাজিক মূল্যবোধকে অক্ষুন্ন রেখেছে।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'-এর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আর একটি কথা বিশেষ ভাবে বলা প্রয়োজন। 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' বেশীর ভাগ উপন্যাস একটি নৈতিক মানদণ্ডে রেখে দাম্পত্য সম্পর্ক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর উপন্যাসে যখন কোন দাম্পত্য জীবনের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ ঘটেছে, তখনই তিনি স্ত্রীচরিত্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' এই ধারণা থেকে সরে এসে মৃত্যুকে তিরস্কার করে জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি চরিত্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধান করে উপন্যাসের যবনিকা টানেননি, অসমবিবাহের জটিলতা তাঁকে গভীর ভাবে ভাবিয়েছিল। 'চোখের বালি', 'নষ্টনীড়' উপন্যাস সেই ভাবনার পরিণত রূপ হিসেবে রচিত। পরবর্তীকালে তিনি 'ঘরে বাইরে' ও 'যোগাযোগ' উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের গভীরে নিহিত কিছু সঙ্কট নিয়ে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র' তাঁর বেশীর ভাগ উপন্যাসে যেখানে 'ত্রিভুজ ছকে' পরিণয় সম্পর্ক তৈরি করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ' সেখান থেকে সরে এসে 'চতুর্ভুজ ছক' তৈরি করেছেন 'মহেন্দ্র'-'আশা'-'বিনোদিনী' ও 'বিহারী'কে নিয়ে। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' পরবর্তীকালে অনেকে এই 'ত্রিভুজ ছক' ও 'চতুর্ভুজ ছক' গ্রহণ করে উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু কিছুটা হলেও ব্যতিক্রমী 'আশাপূর্ণা দেবী', কারণ তাঁর উপন্যাসে তৃতীয় অথবা চতুর্থ ব্যক্তির প্রবেশের ফলে দাম্পত্য সম্পর্কে সংকটের ছায়া তেমন ভাবে কোথাও ঘনিয়ে আসেনি। তাঁর উপন্যাসে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পারিবারিক ছোট অথবা বড় সমস্যা ও মানসিকদ্বন্দ্ব দাম্পত্য জীবনের সংঘাত তৈরির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' ও 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' প্রভাব তাঁর সাহিত্যে থাকার জন্য তিনি খুব স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন শত বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও নারী কতটা ধৈর্য সহকারে দাম্পত্য সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে চায়। আবার

শেষপর্যন্ত ‘সত্যবতী’, ‘সুবর্ণলতা’, ‘সুরেখার’ মতো নারী চরিত্রের ঘর-সংসার ছেড়ে আত্মান্বেষণের জন্য পথে নামতে হয়, নিজেদের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনে দিয়ে। এই চিত্রও তাঁর উপন্যাসের প্রেক্ষিতে সেদিনকার পটভূমিকায় নবতম সংযোজন। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের’ উপন্যাসে সময়ের প্রক্ষেপে কাহিনীর দ্রুততা তেমনভাবে দেখা যায় না। দাম্পত্য জীবনের চিত্রাঙ্কণেও তিনি একইভাবে হালকা ঢেউ এর দোলা দিয়ে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। ‘নষ্টনীড়’ ও ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের কাহিনী উক্ত প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায়। প্রথমটিতে দেখা যায় স্বামীর অনাগ্রহ, ব্যস্ততা ও নিঃসঙ্গতা ক্রমশ নায়িকা ‘চারুলতা’কে বিপথে চালিত করে। ‘অমল’ সেই সুযোগে ধীরে ‘চারুলতা’র সমস্ত মনের অধিকার করে নেয় তার সহজাত ভঙ্গীতে। ‘অমল’ চলে যাওয়ার পর ‘চারুলতা’র মনে যেরকম তোলপাড় অবস্থার তৈরি হয়, তাতে অস্থিরতার ভ্রূক্ষেপ নেই, নেই দ্রুত লয়ে ছন্দ পতনের ঘটনা। ‘রবীন্দ্র সাহিত্যে’ এরকম অবস্থার প্রকাশ ঘটে থাকে ধীর শান্ত ও সংযত ভঙ্গীতে। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে অনুরূপ ভাবে ‘বিমলার’ মনের বিবর্তন ও মেকি ঝলকানিতে ভুলে স্বামীর অগোচরে ‘সন্দীপের’ প্রেমাবেশে পদস্খলনের পরে চেতনা প্রাপ্ত হলে, ঔপন্যাসিক কোথাও ‘পুনঃ মুষিক ভব’ অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে অস্থিরতার প্রকাশ ঘটাননি। মূলত ‘রবীন্দ্র সাহিত্য’কে নানারকম সম্পর্কের বিশ্লেষণ, ন্যায়বোধ, নীতিবোধ ও সর্বোপরি গভীর মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ উপন্যাসে অনুরূপ ভাবে ধীর লয়ে নির্দিষ্ট ছন্দে মূল্যবোধের মাত্রা অক্ষুন্ন রেখে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ করতে দেখা যায়।

‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের’ উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙালী জীবনের যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তাতে করে দাম্পত্য জীবনের নতুন থেকে নতুনত্বের সন্ধান লাভ করা সম্ভব। আমরা ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ সঙ্গে তাঁর উপন্যাসে

দাম্পত্য সম্পর্ক তুলনামূলক আলোচনার জন্য প্রতিনিধিস্থানীয় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাসের কথা তুলে ধরে বিশ্লেষণ করবো। 'শরৎচন্দ্রের' উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের অন্বেষণে আগে বিবাহ ও দাম্পত্য কেন্দ্রিক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-চেতনা নিয়ে, সমালোচকদের মন্তব্যের ভিত্তিতে বলা যায়–

''বিবাহ শব্দটির ব্যাপ্তি এবং গভীরতা দুই-ই শরৎচন্দ্রের রচনায় আছে। তিনি সেই কথাকার যিনি জীবন ছেনে নর-নারীর বিবাহ ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন। তাঁর প্রখর সমাজচেতনা এবং সহানুভূতিকাতর মন নারীর দিকে ঝুঁকেছিল। দেখেছিলেন পুরুষের সমাজব্যবস্থা নারীর শ্বাসরোধ করে তোলে। তাই স্বয়ং ব্রাহ্মণ হয়েও কৌলিন্যপ্রথার প্রতি তাঁর রোষকষা দৃষ্টি। বর্ণগৌরব তাঁকে কোনভাবে আচ্ছন্ন করেনি। রূঢ় বিদ্রুপ লিখেছেন বৃদ্ধ জরদগব কুলীনের বিবাহকাহিনী, যার অন্তে শোনা যায় বালবিধবার বুকচাপা কান্না। সেই বালবিধবার পদস্খলনে কিংবা বিধবার অচরিতার্থ প্রেমের ছবি আঁকায় চিনি বিষন্ন কোমল স্বভাবী লেখক। অন্যদিকে প্রেম থেকে বিবাহ কিংবা বিবাহ পরবর্তী প্রেমের বর্ণনায় তাঁর মুখ হয়ে ওঠে সহসা উজ্জ্বল। স্বামী-পুত্র-পরিবার নিয়ে আনন্দে ভরপুর নারীর মধ্যে তিনি দেখেন নারী জীবনের সার্থকতা। আবার তিনি তো বিবাহ বিচ্ছেদের পক্ষেও আছেন। নতুন নারী গ্রহণ পুরুষের অধিকার হলে নারীই বা কেন সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে''।[১৩]

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন নিয়ে সমালোচক 'সুদীপ বসু'র উক্ত মন্তব্যের নির্যাসে উঠে আসে গোটা সাহিত্যের ভিত্তিতে 'শরৎচন্দ্রের' সমাজচেতনা। অবশ্য দাম্পত্য-প্রেম ও দাম্পত্য বহির্ভুত প্রেম নিয়ে 'শরৎচন্দ্রের' মত তুলনায় অন্য সকল ঔপন্যাসিকের থেকে একেবারে পৃথক ছিল। তিনি একদিকে যেমন দাম্পত্য জীবনের স্বচ্ছন্দতা পছন্দ করতেন, অন্যদিকে তেমনি দাম্পত্য জীবন বহির্ভূত প্রেমকেও প্রাধান্য দিতেন। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর এই যুগ্ম ধারণার প্রকাশ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। 'শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়'

‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থে লিখেছেন–

‘‘প্রেম সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও সহানুভুতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি বরাবরই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব। বিবাহের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না হইলেও, সামাজিক অনুমোদনের ছাপমারা না থাকিলেও, চিরাভ্যস্ত সংস্কারের খোলস বর্জিত না হইলেও প্রেমের যে একটা নৈসর্গিক মহত্ব, একটা বিপুল আত্মলোপী আবেশ আছে, সে বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রথম বয়সের উপন্যাসেও বেশ সচেতন আছেন’’।(১৪)

প্রেমের এই নৈসর্গিক মহত্ব ও আত্মলোপী আবেশকে ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ অনেক ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনের ভিত্তিতে উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ করার মতো সুখী-দাম্পত্য জীবনের কথা তেমনভাবে তাঁর কোন উপন্যাসেই দেখা যায় না। তিনি ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ সৃষ্ট ‘ত্রিভুজ ছকের’ প্রেমের রীতিকে অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করে উপন্যাসের মধ্যে চারিত্রিক দ্বন্দ্ব তৈরি করেছেন, ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসটি আলোচ্য বিষয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তবে ‘বিরাজ বৌ’ উপন্যাসের গল্পের মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের সুষ্ঠ একাত্ম মিলন দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু উপন্যাসের সমাপ্তিতে দারুণ বিপর্যয় অগাধ প্রীতি, ঈর্ষা ও অভিমানজাত সন্দেহ বিকারের কারণে ‘বিরাজ’ ও তার দাম্পত্য জীবনে কিছুটা অশান্তি ঘনিয়ে আসে। আসলে ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ জীবনের দ্বন্দ্বকে অনেকটাই স্বীকার করে নিয়েছেন কাহিনীর রস ঘনীভূত করার জন্য। অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের রচনায় মূলত স্বামী-স্ত্রীর সুখী দাম্পত্য জীবন প্রাধান্য পেয়েছে। সেইসব ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ, তিরস্কার ও মনমালিন্য ছিল একেবারে ব্যতিক্রমী ঘটনা। কিন্তু পরবর্তীকালে ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’, ত্রয়ী-বন্দ্যোপাধ্যায় ও ‘আশাপূর্ণা দেবী’দের মতো ঔপন্যাসিকদের কাছে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ ওতপ্রোত ভাবেই উপ্ত হতে দেখা যায়। তাঁদের উপন্যাসে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সমস্যাকে উত্তপ্ত করে আগুনে পুড়িয়ে

লৌহশলাকার মতো নিংড়ে তৈরি করা হয় চরিত্র। আর তাই চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি হয়ে দাঁড়ায় মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের কারণ। আধুনিক ঔপন্যাসিকরা মনে করেন–

''স্থায়ী বন্ধন মাত্রই আনে অতৃপ্তি ও বন্ধনছেদের দুর্নিবার আকাঙ্খা, দাম্পত্য শান্তি ঝটিকার ক্ষণবিরতি মাত্র, এক অনিশ্চিত ও কৃচ্ছসাধ্য ভারসাম্যের উপরই নির্ভরশীল''[১৫]।

এই ধারা কিছুটা 'আশাপূর্ণা দেবী' তাঁর লেখার মধ্যে অনুসরণ করেছেন। তবে তিনি 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের' মতো উপন্যাসের মধ্যে দাম্পত্য-পূর্ব প্রেমকে তেমন বেশী প্রাধান্য দেননি। তাঁর মতে দাম্পত্য-পরবর্তী প্রেমই আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ তাতে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' সেখানে ব্যতিক্রমী, তাঁর 'পল্লীসমাজ', 'দেবদাস', 'শ্রীকান্ত' ইত্যাদি উপন্যাসে দাম্পত্য-পূর্ব প্রেমকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের সার্বিক সুষ্ঠ রূপায়নে দুজন ঔপন্যাসিক সমান কৃতিত্বের অংশীদার।

'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের' পর যে পুরুষ ঔপন্যাসিকরা সাহিত্যের জগতে পদার্পণ করেন, তাঁরা সকলেই প্রায় 'আশাপূর্ণা দেবীর' সমসাময়িক। চিন্তা-চেতনাতেও প্রায় সম-সহানুভূতি সম্পন্ন ও সহধর্মী। তাই 'বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়', 'শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়', 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', 'জগদীস গুপ্ত', 'সুবোধ ঘোষ' প্রমুখদের রচনার সঙ্গে 'আশাপূর্ণা দেবীর' উপন্যাসের দাম্পত্য সম্পর্কের বিষয়ে তেমন বেশী পার্থক্য দেখা যায় না। সকলেই প্রায় একই যুগ যন্ত্রনা ও সামাজিক পরিস্থিতিতে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাই সার্বিক দিক থেকে হয়তো পার্থক্য নয় মিল বেশী চোখে পড়বে।

‘আশাপূর্ণা দেবী’ পুরুষ ঔপন্যাসিকদের কাছ থেকে আলোচ্য বিষয়ে যেমন অনেকটাই ঋণী, তেমনি নিজেও দিয়েছেন অনেকটাই। তিনি দাম্পত্য জীবনের নতুন দিশা তেমন ভাবে দেখাতে পারেননি, কিন্তু বহুকাল ধরে লালিত-পালিত কুসংস্কারে আবদ্ধ পুরুষ শাসিত দাম্পত্য জীবনের সংস্কার সাধনে অনেকটাই জয়ী হয়েছেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে আমরা সেখানেই তাঁর সাহিত্যের সার্থকতাকে মান্যতা দিয়ে মাথা উঁচু করে তাঁর দিকে তাকাই।

<<<<<>>>>>

তথ্যসূত্র

১) Webster's, Encyclopedia Unabridged Dictionary of the English Language, New York-1989, Page-299.

২) Dr. Sarbapally Radhakrisnan, Contemporary Indian literature, George, K.m. (Ed). 1984. Page-84

৩)বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., পুনর্মুদ্রণ-২০১১/১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫৩-১৫৪.

৪) রামতনুলাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, সম্পাদনা-বারিদবরণ ঘোষ,নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., প্রথম সংস্করণ-১৯০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২১.

৫) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., পুনর্মুদ্রণ-২০১১/১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬৭.

৬) মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা, সুদক্ষিণা ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪৬.

৭) অন্নপূর্ণার মন্দির, নিরুপমা দেবী, প্রথম প্রকাশ-১৯১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫৪.

৮) প্রথম প্রতিশ্রুতি, আশাপূর্ণা দেবী, মিত্র ও ঘোষ প্রা. লি., পৃষ্ঠা সংখ্যা.৮৩

৯) সমকালের জিয়নকাঠি, সম্পাদক- নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, আশাপূর্ণা দেবী বিশেষ সংখ্যা, ২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৯০.

১০) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., প্রথম প্রকাশ-১৯৬৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪২৪.

১১) বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৫.

১২) বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৫.

১৩) উপন্যাসে বিবাহ, সম্পাদনা-অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পূর্বা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ-১৪১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৬.

১৪) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., পুনর্মুদ্রণ-২০১১/১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২৬.

১৫) কালের প্রতিমা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৪১.

<<<<<>>>>>